মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, জেঠসাহী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

অঞ্জলির একটি শুভ্র ফুল : আমাদেরই বটুকদা

দরবেশ

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কবিতা লিখেছেন, ''একটি শুভ্র ফুলের জন্য''। সেই কবিতাটির শেষ লাইন। অঞ্জলির একটি শুভ্র ফুল।

নিঃসন্দেহে, কবিতাটি অমর। কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয়, অঞ্জলির সেই শুভ্র ফুলটি আর নেই।

এখানে-ওখানে সবখানে ঘুরতে তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। শারদীয় উৎসবের পর দক্ষিণ ভারত থেকে তিনি কলকাতায় ফিরছিলেন কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে। একা একা। একা অথচ, পরিবেশিত সংবাদ অনুসারে, ট্রেনের কমপার্টমেন্টের অপরিচিত সহযাত্রীদের সাথে তাঁর স্বভাবসুলভ হৃদ্যতার অভাব ছিল না বিন্দুমাত্র। এক্সপ্রেস ট্রেন সকালে যখন কলকাতায় এসে পৌঁছুল, অন্য টিকিট কেটে তিনি চির-অজানার পথে পথিক হয়ে পড়েছেন। তাজা, শুভ্র, অতিশয় জ্যান্ত, নানাগুণসমন্বিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আমাদের বটুকদা আর নেই।

ছাই হয়ে গেল শুভ্র ফুলটি। আমাদেরই অতিপ্রিয় বটুকদা। নিতান্তই অসময়ে, মাত্রই প্রৌঢ় বয়সে, যখন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অফুরাণ। অথচ তিনিই আমাদের বলে গেছেন, উৎসবের ঋতু নেই, মৃত্যুরও কালাকাল নেই।

তথাপি, কিংবা সেই জন্যেই, শুভ্র একটি ফুলের ছাই হয়ে যাওয়াটা বুকে বাজে। শুধু তাঁর শিল্পীসত্তার মাধ্যমেই নয়, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে, আমাদের পরিচয়ের শেকড় ছিল সুগভীর। দিল্লীর অলি গলি, পথঘাট, চাঁদনিচক আর পুরোনো কেল্লার সঙ্গে তাঁর যেমন আত্মজ ঘনিষ্ঠতা ছিল, আমাদের মত নগণ্যের সাথেও তাঁর প্রীতি ছিল অশেষ। সঙ্গীত, কবিতা, সুর, মুসাফিরি, নিরলস আড্ডা, এই সমস্ত ছাপিয়ে বিস্ময়কর ও অফুরন্ত ছিলেন তিনি আমাদের কাছে, অখণ্ড মানসিকতায়, নিত্যনতুন শব্দ-উদ্ভাবন শক্তিতে, আলাপ নৈপুণ্যে এবং সুনির্মল সদাপ্রফুল্লতায়। তাঁর সঙ্গমাত্র, আমাদের মধ্যেও সজীব-প্রফুল্লতা সংক্রমিত হয়ে পড়ত সূর্যোদয়ের মত। তাঁরই সান্নিধ্যের প্রভাবে যেন দেখতে পেতুম আগতপ্রায় এক নবজীবন। এই সমাজটাকে কি ভেঙ্গে চুড়ে নতুন করে গড়া যায় না? যায় না?

তাঁরই সান্নিধ্যে আমাদের অজ্ঞাত চৈতন্যের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হয়ে যেত আমাদের জড়তার। আমাদের কাছে অসাধারণ ছিলেন তিনি মানুষ হিসেবে এবং অনেককালের সঙ্গী হিসেবে। যা লিখতেন তিনি, যা গাইতেন, সে সব ছিল নিখাদ তাঁর নিজ-জীবনের অবিকল প্রতিবিম্ব। শিল্প এবং মানুষ একাত্ম হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। এবং এই বিরলতার বিরলতম নিদর্শন ছিলেন আমাদের বটুকদা। কবিতার বিষয়বস্তুতে কোনো প্রকার আস্থা না রেখেও কবিরা আখচার কবিতা লেখেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হন কবিতার জগতে। সঙ্গীতের আত্মজ না হয়েও গায়করূপে বহুজনপ্রীতিলাভ করেন অনেক কণ্ঠশিল্পী। সুরের সঙ্গে স্ববিরোধিতা করেও একাধিকজন স্বরলিপির রচয়িতা হন প্রায়শই এবং হাততালি পান অজস্র মানুষের। ব্যক্তিগত

মিলনসাগর
www.milansagar.com

নিত্যকার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি আমাদের বটুকদা, কি সৃজনশীল ভূমিকায়, কি মানবতাবোধসাম্যধর্মে ছিলেন অখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষ। এও নিশ্চিত জানি, তাঁর কোথাও ছিল না কোনো ভেজাল বা চটক। অবিমিশ্রভাবে তিনি ছিলেন, এই অবক্ষয়ের ভারতে, মাত্রাধিক একজন সাচ্চা শিল্পীমানব। সেখানে বণিক বৃত্তির সাথে তাঁর কোনোপ্রকার সখ্যতা ছিল না। প্রাণলক্ষ্মীর সাধনায় তিনি ধনলক্ষ্মীকে অবহেলা করেছেন বারংবার, শত প্রলোভন সত্ত্বেও। কাজেই, কি সাহিত্যের ক্রিয়াকর্মে, কি সুরকার হিসেবে অথবা স্বরশিল্পীরূপে জীবিতাবস্থায় তাঁকে উপযুক্ত সম্মানিত হতে দেখেছি আমরা ক্বচিৎ। অথচ সাংসারিক অর্থে সম্মান যাঁরা দেন তাঁদের ওপরেও তাঁর প্রভাব কিছু কম ছিল না। সেই প্রভাব তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি।

বটুকদার প্রত্যেকটি কবিতার বিষয়বস্তু ছিল যা এক্ষুণি বলা চাই, এতই জরুরী। এবং আপোসহীন সে বক্তব্য। তিনি তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্বাস করতেন খেটে খাওয়া মানুষের মুখে একদিন হাসি ফুটে উঠবেই, এবং সেই গানই তিনি গেয়েছেন আমৃত্যু। মানুষের গান।

আমাদের বটুকদা আর নেই। মৃত্যু আমাদের নিত্যসহচর জানা সত্ত্বেও কখনো ভাবতে পারিনি, কোনো একসময়ে এই রচনা লিখতে হবে। বটুকদা নেই কখনো ভাবিনি, তাঁর প্রসঙ্গ এভাবে "অজন্তা" পত্রিকায় প্রকাশ হবে। "অজন্তা"-র জন্মলগ্ন থেকে বিগত একযুগকাল এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি সম্পাদনার দায়িত্বে, লেখককের দায়িত্বে, সর্বোপরি আমাদের প্রেরণা হিসেবে।

তাঁর মতন শুভ্র একটি ফুলের কাছে "অজন্তা" নিতান্তই একটি ক্ষুদ্র পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও, নিজের বিরাট প্রতিভাকে ক্ষুদ্রের মধ্যে দিয়েই ফুটিয়ে তোলা ছিল তাঁর সহজাত ধর্ম। বড়মাপের প্রভাবশীল কোনো পত্রপত্রিকার সঙ্গে কখনোই তিনি যুক্ত হতে পারেন নি, সে প্রচেষ্টাও তাঁর মত টলটলে সরল প্রকৃতির লোকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, যদিও বাংলা সাহিত্যজগতের কাণ্ডারীদের কারো সাথেই তাঁর মিত্রতার অভাব ছিল না। বস্তুত তাঁদের অনেকেই চেষ্টা করেছেন বৃহত্তর পাঠক-সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটাতে। স্বভাবতই, "নবজীবনের গান" এবং "মধুবংশীর গলি"-র স্রষ্টাকে কারো পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব। তবু তিনি থেকে গেছেন একমাত্র তিনিই, আমাদের বটুকদা। মাথা উঁচু করে, প্রজ্জ্বলন্তভাবে "সামান্য এক ছাপোষা মানুষ।"

কে যেন কবে বলে গেছেন, স্মল ইজ বিউটিফুল। প্রকারান্তরে বটুকদার জীবনটা সেই কথা বলে। মুখে নয়, কাজে। এবং জীবনকে উৎসর্গ করে। তিনি ভালোবাসতেন ছোটমাপের হয়ে থাকতে। স্টেজের পেছনে। অথচ তিনি ছিলেন ভীষণভাবে একজন প্রথম সারির কবি। প্রথম সারির সুরস্রষ্টা। এবং প্রথম সারির গীতিকার। এইজন্যেই অসামান্য তাঁর মৃত্যুতে শ্মশানসঙ্গী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবিরা, রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, গণ্যমান্য নাগরিকরা, ছোট-বড় পত্রিকার কর্মচারীরা এবং খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিরা। এমন শোকযাত্রার মিছিল বহুকাল কলকাতার রাজপথে দেখা যায়নি। তবে এটা কি এই প্রমাণ করে না, বিচ্ছেদই মানুষকে স্মরণীয় করে তোলে? কোনো শুভ্র ফুল কি কখনো ছাই হয়ে যায়?

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কলোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।